( অষ্টাদশবিধ )

# নক কর্মপদ্ধতি

হার অর্থ ও স্থান

াস করমচাঁদ গান্ধী কৃত

দ্বিতীয় সংস্করণ

চন্দ্র দাস গুপ্ত অনূদিত

# বিজ্ঞপ্তি

## খাদি প্রতিষ্ঠান

### গঠন ও কর্ম পরিচয়

খাদি প্রতিষ্ঠান ১৯২৪ ইং সনে একটী দাতব্য ট্রাষ্ট বলিয়া গঠিত হয়। বিশেষ করিয়া খাদি উৎপাদন ও বিক্রয় করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে কুটির-শিল্পের উন্নতি করাও অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূলধন ট্রাষ্টিগণ ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা দান করিয়াছেন। শ্রীহেমপ্রভা দেবী ইহার সম্পাদিকা। শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ইহার অন্যতম ট্রাষ্টি। স্বর্গত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত ইহার ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

খাদি প্রতিষ্ঠান যেসকল শিল্প হাতে লইয়াছে, সেই সকল শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন ও বিক্রয় করার ব্যবসাও ইহার হাতে। এই দিক দিয়া ইহাকে ব্যবসাদারী অনুষ্ঠান বলা যায় এবং তাহা ঠিকই বটে। তবে অন্য সাধারণ ব্যবসাদার হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, সাধারণ ব্যবসাদার লাভের জন্য কারবার চালায়, আর খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য লাভ করা নয়, যে-শিল্প সৃষ্টি বা সংরক্ষণের কার্য ইহা হাতে লয়, সে উদ্দেশ্য পূরণ করাই ইহার কাজ। যদি খাদি প্রতিষ্ঠানের কাজে লাভ হয়, তবে সে লাভ গ্রামের শিল্পোন্নতির চেষ্টাতে অথবা গ্রামবাসীদের সাধারণ অবস্থা ভাল করার জন্যই ব্যয় হয়। এই সকল কার্যে যে ব্যয় হয়, তাহা যে কারবারের লাভ হইতেই করা হয় এমন নয়, প্রতিষ্ঠানের মূলধনও এই উদ্দেশ্যে ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এইভাবে লাভের অংশ ব্যয় করিয়াও তাহার উপর প্রতিষ্ঠানের ফণ্ড বা মূলধন হইতে এতাবৎ তিন লক্ষ টাকার উ পর ব্যয় করা হইয়াছে।

# গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি

## দ্বিতীয় সংস্করণের

# ভূমিকা

'গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি' পুস্তিকাখানা আমি ১৯৪১ সালে লিখিয়াছিলাম। ইহা তাহারই সম্পূর্ণ সংশোধিত সংস্করণ। এই পুস্তিকায় যে কয়টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেগুলি কোনও বিশিষ্ট ক্রম অনুসরণ করিয়া করা হয় নাই—বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী তো অবশ্যই সেগুলি সাজান হয় নাই। যদি কোনও পাঠকের নিকট কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে এইরূপ মনে হয় যে, উহা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অথচ এই পুস্তিকায় উল্লেখ নাই, তখন তিনি যেন এ কথা মনে করেন, ঐ বিষয় যে বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। আমার কৃত তালিকা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে, কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা মার্গ-প্রদর্শক বলিয়া ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে। কতকগুলি নূতন ও জরুরী বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

পাঠকগণ, কর্মীই হউন বা স্বেচ্ছাসেবক হউন বা না হউন, যেন অবশ্য এ কথা বুঝেন যে, রচনাত্মক কার্যই হইতেছে সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ লাভের পথ। ইহার সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার মানেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এই রচনাত্মক কর্মপদ্ধতির লক্ষ্য হইতেছে—ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া উপর পর্যন্ত জাতি গঠন। মনে করুন, দেশের ৪০ কোটি লোকই সর্বতোভাবে সমস্ত রচনাত্মক কর্মগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিয়া গেল। ইহার দ্বারাই যে সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে—স্বরাজ দ্বারা যাহা কিছু বুঝা যায় সে সমস্তই, বিদেশী শক্তিকে ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই যে সম্ভব, সে কথা কি আর কাহারও

অস্বীকার করার পথ আছে? যখন সমালোচকেরা উক্ত প্রস্তাব লইয়া হাসাহাসি করেন, তখন তাঁহারা হয়ত এই কথাই বুঝাইতে চাহেন যে, ৪০ কোটি লোক কদাচ একযোগে এই রচনার কার্য করিতে স্বীকৃত হইবে না। এই পরিহাসের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কিন্তু ইহাই উত্তর যে, এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করার যোগ্য। একদল নিষ্ঠাবান কর্মী যদি দৃঢ় সংকল্প লইয়া বসে, তবে তাহারা দেখিবে যে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা অন্য অনেক পরিকল্পনা অপেক্ষা সহজ।

সে যাহাই হউক, ভারতের স্বাধীনতা যদি অহিংস উপায়ে লাভ করিতে হয়, তবে আমার কাছে ইহার বদলে অন্য কিছুই দিবার মত নাই।

আইন অমান্য ব্যাপকই হউক অথবা ব্যক্তিগতই হউক, উহা দ্বারা রচনাত্মক কার্যের সহায়তা হয়। উহা সশস্ত্র বিরোধের বিকল্পে পরিপূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য। সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে যেমন ট্রেণিং লাগে, তেমনি রচনাত্মক কার্যের জন্যও ট্রেণিং লাগে। পথই কেবল বিভিন্ন। উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্রোহাত্মক কাজ তখনই আরম্ভ হয়, যখন তাহার অবসর আসে। মিলিটারী বিদ্রোহের জন্য ট্রেণিং লইতে হইলে অস্ত্রের ব্যবহার শিখিতে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়ত আণবিক বোমা (Atomic Bomb) পর্যন্ত পহুঁছিতে হয়। আর অপর দিকে আইন অমান্যের জন্য কেবল রচনাত্মক কার্যপদ্ধতিকে কেমন করিয়া কাজে আনা যায় তাহাই শিখিতে হয়।

এই হেতু কর্মীরা আইন অমান্য করার অবকাশ খুঁজিবেন না। যদি রচনাত্মক কর্মকে নিষ্ফল করার চেষ্টা চলে, তবেই তাঁহারা আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইবেন। দুই একটা দৃষ্টান্ত হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে, কোন ক্ষেত্রে আইন অমান্য করা যায়, আর কোন ক্ষেত্রে যায় না। আমরা এ কথা জানি যে, রাজনৈতিক চুক্তি গতকালে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া

যখন কোনও চুক্তি নাই, তখন অপরের সহিত ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তো বন্ধ করা যায় না। এই ধরণের নিঃস্বার্থ ও অবিমিশ্র বন্ধুত্বই রাজনৈতিক চুক্তির ভিত্তি হইতে পারে। তেমনি আবার কেন্দ্রীভূত খাদি প্রচেষ্টা গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে নিষ্ফল করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু নিজের জন্য খাদি তৈরী ও ব্যবহার করা কোনও শক্তিই বন্ধ করিতে পারে না। খাদির উৎপাদন ও ব্যবহার জোর করিয়া লোকের উপর চাপান উচিত নয়। কিন্তু লোকের পক্ষে আবার সুতাকাটা ও খাদি পরিধান করাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। গ্রামগুলিকে প্রাথমিক কর্মকেন্দ্র বলিয়া গড়িয়া তুলিলেই এই কার্য হইতে পারে। এই ধরণের কাজে প্রথম প্রবর্তকেরা বাধাপ্রাপ্ত হইতেও পারে। প্রবর্তকদিগকে জগত জুড়িয়া সর্বত্রই ক্লেশ স্বীকার করার অগ্নি-পরীক্ষায় পার হইতে হয়। ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত স্বরাজ লাভ হইতে পারে না। যখন হিংসার আশ্রয় দ্বারা কার্য সিদ্ধির পথ লওয়া হয়, তখন 'সত্য'ই সবার শ্রেষ্ঠ পরিত্যাজ্য বস্তু হইয়া পড়ে, আবার অহিংসায় উহাই চিরজয়ী হয়। অপরদিকে সরকার পক্ষের লোকদিগকেও শত্রু বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলিবে না। ঐরূপ করিলে অহিংসার বিরুদ্ধাচার করা হইবে। দুই প্রতিপক্ষকে দুই পথ লইতে হইবেই, কিন্তু আমাদের ছাড়াছাড়িটা বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া চাই।

যদি এই প্রাথমিক মন্তব্যগুলি পাঠকের মর্ম স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে তিনি রচনাত্মক কর্মপদ্ধতিকে গভীর আগ্রহ প্ররোচক বলিয়া পাইবেন। অন্ততঃ রচনাত্মক কর্মকে রাজনৈতিক কাজ বা বক্তৃতা করা অপেক্ষা অধিক রোচক এবং অধিকতর জরুরী ও কার্যকরী বলিয়া বুঝিবেন।

পুণা, ১৩-১১-৪৫। মোঃ কঃ গান্ধী

শ্রীহেমপ্রভা দেবী কর্তৃক
খাদি প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা
১৫ কলেজ স্কোয়ার, হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৪২
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৪৬
মূল্য—।৵০ ছয় আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী
খাদি প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪ পরগণা।

## নির্ঘণ্ট

( অষ্টাদশ বিধ )

# গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি

## উহার অর্থ ও স্থান

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি কি, তাহা ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে উহা 'পূর্ণ স্বরাজের গঠন'ই অথবা বলা যায় যে, ইহাই হইতেছে সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

হিংসার পথে অর্থাৎ অসত্যের পথে স্বাধীনতার গঠন যে কি, তাহা ত আমরা দুঃখের ভিতর দিয়া বেশ ভাল ভাবেই জানিতেছি। বর্তমান যুদ্ধে প্রতিদিন যেভাবে জীবন ও সত্যের সংহার করা হইতেছে, সেই দিকে দেখিলেই ইহা বুঝা যায়।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, সত্য ও অহিংসার দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তি মানে প্রত্যেকেরই স্বাধীন হওয়া অর্থাৎ জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে দেশের নগণ্যতম ব্যক্তিরও স্বাধীনতা লাভ। এই প্রকারে স্বাধীনতা মূলতঃ কাহাকেও বাদ দিয়া হওয়ার নয়। সেই জন্যই পারস্পরিক নির্ভরতার সহিত ইহা সম্পূর্ণই মিশ খাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তত্ত্বে যাহা থাকে কার্যতঃ ততটা কখনও লাভ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ যেমন ধরা যায় যে জ্যামিতির সংজ্ঞার ভিতর রেখা বলিতে যে জিনিষ বুঝায় কোনও অঙ্কিত রেখাই সে জিনিষ নয়। এই হেতু পূর্ণ স্বাধীনতা সেই পরিমাণে পূর্ণ হইবে, যে পরিমাণে আমরা কার্যতঃ ঐ সংজ্ঞার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

পাঠক যদি মনে মনে গঠনমূলক কার্য পদ্ধতির সমস্তটাই ছকিয়া ফেলেন, তবে তিনি আমার সহিত এবিষয়ে একমত হইবেন যে, যদি এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা যায়, তবে সে পরিণতির ফলে

আমরা যে প্রকারের স্বাধীনতা চাই তাহাই পাইব। মিঃ এমারীও কি এই কথায় বলেন নাই যে ভারতীয় দুইটি বড় বড় রাজনৈতিক দল যদি একমত হয় অর্থাৎ আমার ভাষায়, যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্য হয়, তবে তাহাদের দাবী মানিয়া লওয়া হইবে? মিঃ এমারীর আন্তরিকতায় আমাদের অবিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই, কেননা যদি সাম্প্রদায়িক ঐক্য সততার পথে অর্থাৎ অহিংসার পথে লাভ করা যায়, তবে তাহার ভিতরেই এমন শক্তির উদ্ভব হইবে, যাহা সাম্প্রদায়সমূহের সংযুক্ত দাবী মানিয়া লওয়াইতে বাধ্য করিবে।

অপরদিকে দেখা যাইবে হিংসার দ্বারা যে স্বাধীনতা প্রাপ্তব্য, তাহার তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক কোনও একটা পূর্ণ সংজ্ঞাই দেওয়া যায় না। কেননা উহার ভিতর এই অবস্থাই ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, দেশের ভিতরের যে দলটা হিংসার সব চাইতে বেশী কার্যকরী প্রয়োগ করিতে পারিবে সেই দলেরই প্রাধান্য হইবে। উহাতে অর্থ-নৈতিক বা অন্য প্রকার সম্পূর্ণ সমতা প্রাপ্তির কল্পনাই করা যায় না।

আমার উদ্দেশ্য হইতেছে অহিংসা প্রণোদিত চেষ্টার ভিতর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা পাঠককে বুঝান। ইহার জন্য এ কথা মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন নাই যে হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। যদি পাঠকের ইচ্ছা হয় তবে এ ধারণা পোষণ করিতে পারেন যে হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মধারার ভিতরও নগণ্যতম লোকেরও স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব।

এক্ষণে গঠনমূলক কার্যের যে কয়টা বিধি আছে তাহার আলোচনা করা যাউক।

## ১। সাম্প্রদায়িক ঐক্য

সাম্প্রদায়িক ঐক্য যে প্রয়োজন সে বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু সকলেই কিছু এ কথা জানেন না যে এই প্রকার ঐক্য বাহির হইতে উপরে চাপাইয়া দেওয়া রাজনৈতিক ঐক্য মাত্র নয়। এই ঐক্য মানে

একটা অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ের যোগ। এই প্রকার ঐক্য লাভের জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক কার্য হইতেছে প্রত্যেক কংগ্রেসীর এই ভাব অনুভব করা যে তিনি তাঁহার নিজের ভিতরেই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা জরথুশত্রীয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি ভাবিবেন যে, তিনি নিজের মধ্যে হিন্দু বটেন এবং হিন্দুত্বের বহিস্থঃ যত ধর্ম আছে সেই সব ধর্মীও বটেন।

হিন্দুস্থানের যে কোটি কোটি অধিবাসী আছে, তাহাদের সহিত নিজের একত্ব তাহার নিজের ভিতরে অনুভব করা চাই। এই অনুভূতি পাওয়ার জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসীকেই অন্য ধর্মের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে হয়। অন্য সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি তাহার ততটাই শ্রদ্ধা রাখা চাই, যতটা শ্রদ্ধা সে নিজের ধর্মের জন্য পোষণ করে।

যখন এই প্রকার সৌভাগ্যের অবস্থা হইবে, তখন ষ্টেশনে ষ্টেশনে এই কলঙ্কজনক ধ্বনি উচ্চারিত হইবে না—এটা 'মুস্লিম জল', এটা 'হিন্দু চা', ওটা 'মুস্লিম চা'। স্কুল-কলেজে হিন্দু মুস্লিমের আলাদা জলপাত্র থাকিবে না এবং সাম্প্রদায়িক স্কুল-কলেজ বা হাসপাতাল থাকিবে না। কোনও রাজনৈতিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি না দিয়া, নীতি হিসাবেই কংগ্রেসীদিগকে এই বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিতে হয়। সদাচার বলিয়াই এই নীতি পালন করিতেছেন, ইহাই মানিয়া লইতে হয়। ইহার স্বাভাবিক ফল হইবে রাজনৈতিক ঐক্য।

এই প্রকার হৃদয়ের মিলনের ভিতর যে অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য রহিয়া যায় তাহা বিস্ময়কর—যদিও উহাই হইতেছে ঐ অবস্থা লাভের ন্যায়-সঙ্গত পরিণতি। অপর ধর্মীদের বিরুদ্ধপক্ষীয় হইয়া কংগ্রেসীরা পার্লামেণ্টারী ক্ষমতা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। সেইজন্যই ত যতদিন পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক ভেদ রহিয়াছে, ততদিন পার্লামেণ্টারী ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত হয় না।

আমরা অনেকদিন ধরিয়া ইহাই ভাবিয়া আসিতে অভ্যস্ত হইয়াছি যে, শাসন-পরিষদই হইতেছে ক্ষমতার উৎস। আমি ত এই কথাই

মানিয়া থাকি যে, ঐ প্রকার বিবেচনা করা বিষম ভ্রম। উহা গতানুগতিক অথবা সম্মোহনেরই ফল। বৃটীশ ইতিহাস ভাসা ভাসা ভাবে পড়ার ফলে আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি যে, সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেণ্ট হইতে উৎপন্ন হইয়া জনসাধারণে পঁহুছিয়া থাকে। কিন্তু সত্য কথাটা এই যে, ক্ষমতার অধিষ্ঠান স্থান হইতেছে জনসাধারণ এবং জনসাধারণ যে সময় যাহাকে প্রতিনিধি করে, ক্ষমতা তখন তাহার হাতে বর্তায়। জনসাধারণকে বাদ দিয়া পার্লামেণ্টের কোনও ক্ষমতাই নাই, এমন কি উহার অস্তিত্বই নাই। গত একুশ বৎসর ধরিয়া জনসাধারণকে এই সোজা কথাটা বুঝাইতে আমি চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আইন অমান্য হইতেছে শক্তির ভাণ্ডার ঘর। মনে করুন যে সমস্ত লোকই আইন সভায় পাশ করা কোনও আইন পালন করিতে অনিচ্ছুক এবং আইন না মানার জন্য যে শাস্তি হউক তাহা লইতে তাহারা প্রস্তুত। এইরূপ অবস্থায় তাহারা সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন-যন্ত্রকে অচল করিয়া ফেলিবে। মিলিটারী বা পুলিশ শক্তি সংখ্যালঘু লোকের দলকে, সেই দল যত শক্তিশালীই হউক না কেন, বাধ্য বা বশীভূত করার কাজে আসে। কোনও মিলিটারী বা পুলিশ শক্তি একটা সমগ্র জনসম্প্রদায়ের দৃঢ় সঙ্কল্পকে বলপূর্বক বাধ্য বা বশীভূত করিতে পারে না, যদি তাহারা সমস্ত নির্যাতন শেষ পর্যন্ত সহ্য করা স্থির করে।

পার্লামেণ্টারী কার্যপদ্ধতি তখনই ভাল বলা চলে, যখন উহার সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছানুযায়ী চলেন। মোটের উপর উহা একপ্রকার কার্যকরী তখনই হয়, যখন উহা সহধর্মীর ভিতর ক্রিয়া করে।

বর্তমানে আমরা ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে শাসনযন্ত্র চালাইবার ভান করিতেছি। এই পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিরুদ্ধপক্ষসমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রকার অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট দলসমূহকে একজোট করিয়া আমরা কখনও জীবন্ত ঐক্য লাভ করিতে পারিব না। এই প্রকার আইন সভা

কাজ করিতে পারে। তবে তাহা সত্যকার যাহারা শাসক তাহাদের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত ক্ষমতার ক্ষুদ-কুঁড়া লইয়া কাড়াকাড়ির স্থান হইবে। এই সকল আইন সভা কঠোর দণ্ড প্রয়োগের দ্বারাই শাসন করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহকে একে অন্যের টুঁটি চাপিয়া ধরা হইতে ঠেকাইয়া রাখে। আমি ত মনে করি এই প্রকার হীনতার অবস্থা হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্ভব একেবারে অসম্ভব।

যদিও আমি এই দৃঢ়মত পোষণ করি, তথাপি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যতদিন পর্যন্ত নির্বাচনে অবাঞ্ছিত প্রার্থী সভ্য পদের জন্য দাঁড়ায় ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রার্থী দাঁড় করান উচিত হইবে যাহাতে প্রগতি বিরোধীরা এই সমস্ত পদে প্রবেশ করিতে না পারে।

## ২। অ

আজিকার দিনে হিন্দুধর্মের এই কলঙ্ক দূর করার কথা বেশী করিয়া বলা অনাবশ্যক। কংগ্রেসীরা এই দিকে অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসী এই ব্যাপারকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে আবশ্যক বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য অপরিহার্যভাবে আবশ্যক এ ধারণা অনেকে রাখেন না। যদি হিন্দু কংগ্রেসীরা অস্পৃশ্যতা বর্জন উহার নিজস্ব আবশ্যকতার জন্যই মানেন, তবে তাঁহারা তথাকথিত 'সনাতনী'দিগকে আজকার অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা এই বিষয়টা সনাতনীদের সহিত লড়াই করার বিষয় বলিয়া না লইয়া. অহিংসকের পক্ষে যে ভাব হওয়া উচিত—বন্ধুত্বের ভাব লইয়াই যেন গ্রহণ করেন। আর হরিজন-দের সম্পর্কেও ইহাই আবশ্যক যে, প্রত্যেক হিন্দু তাহাদের সমস্যাকে নিজ সমস্যা বলিয়া মনে করিবেন—তাহাদের ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবেন। হরিজনদের যে একাকীত্ব দুনিয়ায়

তাহার সমান এতবড় নিদারুণ একাকীত্ব আর দেখা যায় না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, এই কাজ করা কত কঠিন। কিন্তু স্বরাজের সৌধ-নির্মাণ করিতে হইলে এই কাজ অবশ্য করণীয়। স্বরাজের পথ ত দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ। এই পথে অনেক পিচ্ছিল চড়াই ও গভীর খাদ আছে। দৃঢ়পদে এই সকল সঙ্কট পার হইতে হইবে, তবে না আমরা স্বরাজশীর্ষে পঁহুছিতে পারিব ও সেখানকার স্বাধীনতার নির্মল বায়ুতে শ্বাস লইতে পারিব।

## ৩। মাদকতা নিবারণ

এই বিষয়টি সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের মতই ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেস কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই অত্যাবশ্যক সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে যতটা আগ্রহ দেখান উচিত, কংগ্রেসীরা তাহা দেখান নাই। যদি অহিংসার পথেই আমাদিগকে আমাদের লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতে হয়, তবে এই সহস্র সহস্র নরনারী যাহারা মদ্যপানাদি ও অহিফেনাদির নেশার কবলে পড়িয়া আছে, তাহাদের অদৃষ্ট ভবিষ্যৎ গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না।

এই অন্যায় দূর করার কাযে চিকিৎসকেরা বড় অংশ লইতে পারেন। মদ ও আফিম ইত্যাদির নেশার কবল হইতে লোককে উদ্ধার করার পথ তাঁহাদিগকে বাহির করিতে হয়। এই সংস্কারকে অগ্রসর করাইয়া দিতে স্ত্রীলোকদের ও ছাত্র সমাজের বিশেষ সুযোগ আছে। তাঁহারা প্রেমপূর্ণ সেবা দ্বারা, যাহারা নেশার কবলে পড়িয়াছে তাহাদিগকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাহারা নেশা ছাড়িতে বাধ্য হয়।

কংগ্রেস কমিটীসমূহ বিশ্রামাগার খুলিতে পারেন। যেখানে ক্লান্ত শ্রমজীবীরা হাত-পা ছড়াইয়া একটু আরাম করিতে পারে এবং সস্তা ও স্বাস্থ্যপ্রদ জলযোগ পাইতে পারে ও উপযুক্ত খেলাধূলা করিতে পারে।

অহিংসার দৃষ্টিতে স্বরাজের দিকে লক্ষ্য করা একটা নূতন জিনিস। ইহাতে পুরাণো মাপ বদলাইয়া গিয়া নূতন ধরণের মাপ বা হিসাবের সৃষ্টি হয়, হিংসার পথে এই ধরণের সংস্কারের কোনও স্থান নাই। যাঁহারা হিংসালভ্য স্বরাজে বিশ্বাসী, তাঁহারা তাঁহাদের অধীরতায় বা অজ্ঞতায় আখেরের দিন পর্যন্ত এই ধরণের সংস্কার ফেলিয়া রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, স্থায়ী ও স্বাস্থ্যপ্রদ মুক্তি ভিতর হইতেই আত্মশুদ্ধি দ্বারাই লভ্য।

গঠনমূলক কর্মীরা আইন দ্বারা মাদকতা তুলিয়া দিবার পথ যদি বা পরিষ্কার করিতে না পারেন, তবে অন্ততঃ আইনের প্রবর্তন সহজ ও আইন কার্যকরী তো করিতেই পারেন।

## ৪। খাদি

খাদি একটা বিতণ্ডার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই মনে করেন যে খাদির সুপারিশ করিয়া আমি ঝড়ের বিপরীত দিকে নৌকার পাল খাটাইতেছি এবং আমার হাতে স্বরাজ-নৌকা ডুবি হইবেই এবং খাদির পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আমি লোককে অন্ধকারের যুগে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি আজ খাদির প্রয়োজনীয়তার কথা লইয়া বিতর্ক করিতে বসি নাই। পূর্বে আমি ইহা লইয়া অনেক আলোচনাই করিয়াছি। আমি এখন ইহাই দেখাইতে চাই যে প্রত্যেক কংগ্রেসী, কংগ্রেসী কেন প্রত্যেক ভারতবাসীই খাদির জন্য কি করিতে পারেন। দেশের ভিতর সকলের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা ও সমতা লাভের মর্মই রহিয়াছে খাদিতে। আমি যাহা বলিতেছি প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষ নিজেই তাহা পরখ করিয়া দেখিয়া তাহার সত্যতা বুঝিতে পারেন। খাদির ভিতর যে অন্তর্নিহিত সত্যগুলি আছে, তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার মানেই হয় ষোল আনা স্বদেশী মনোভাব। ভারতবাসীর জীবন যাত্রার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার সবটা ভারতেই পাওয়ার সংকল্প করা এবং তাহাও গ্রাম্য লোকের শ্রমের

ও বুদ্ধির সাহায্য সংগ্রহ করিয়া লওয়ার সংকল্প খাদি সংকল্পের অর্থ ধরা যাইতে পারে। উহা বর্তমান পদ্ধতির বিপরীত অবস্থার সূচনা করে। ভারতের ও বিলাতের মাত্র গুটিকতক শহর আজ ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের ধ্বংশের উপর পুষ্ট হইতেছে। খাদি মনোবৃত্তিতে তাহা না হইয়া এই সাত লক্ষ গ্রামই হইবে স্বাবলম্বী এবং তাহারা স্বেচ্ছায় ভারতের শহরগুলির সেবা করিবে, চাই কি ভারতের বাহিরের শহরেরও সেবা করিবে, যতক্ষণ তাহা উভয়তঃই কল্যাণকর হয়।

ইহা করিতে গেলে অনেকেরই মনোবৃত্তিতে ও রুচিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান আবশ্যক। কতকগুলি ব্যাপারে অহিংসার পথ যেমন সহজ, অপর কতকগুলিতে ইহা আবার তেমনি কঠিন। ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনকে গূঢ়ভাবে স্পর্শ করে এবং এমন একটা শক্তিতে তাহাকে মণ্ডিত করে, যাহা তাহার নিজের ভিতরেই সুপ্ত ছিল এবং যাহা তাহাকে ভারতীয় জনসমুদ্রের প্রত্যেক বিন্দুর সহিত নিজের একত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে। এই ধরণের অহিংসা মোটেই একটা শূন্য ফাঁকা জিনিষ নয়, যুগ যুগ ধরিয়া আমরা ইহাকে ফাঁকা বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছি। পরন্তু মানুষ যত রকমের শক্তির আস্বাদ পাইয়াছে তাহার মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা তেজঃপূর্ণ শক্তি, যে শক্তির উপর মনুষ্য সত্তার অস্তিত্বই নির্ভর করে। আমি ত এই শক্তিই কংগ্রেসের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং কংগ্রেসের মারফৎ সারা জগতকে উপহার দিতে চাহিতেছি। আমার কাছে খাদি ভারতীয় মনুষ্যসমাজের ঐক্যের প্রতীক, উহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ও সমতার প্রতীক এবং এই হেতু জহরলালের কাব্যময় ভাষায় ইহা "ভারতীয় স্বাধীনতার রাজ পোষাক।"

খাদি মনোবৃত্তিতেই জীবনযাত্রার আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ ক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে। সেইজন্য এই নির্ধারণ চলিয়া আসিতেছে যে, প্রত্যেক গ্রামকেই নিজের আবশ্যক বস্তু উৎপন্ন করিতে

হইবে এবং তাহার প্রয়োজন অপেক্ষাও কতকটা করিয়া বেশী উৎপন্ন করিতে হইবে।

বড় বড় শিল্পগুলি প্রয়োজন বশতঃই কেন্দ্রীভূত ও জাতীয় সম্পত্তি করিতে হইবে, কিন্তু গ্রাম্য জীবনের জাতীয় অভিব্যক্তিকে তাহাদের স্থান নগণ্য থাকিবে।

খাদির ভিতরের নিহিত অর্থের পরিচয় দেওয়ার পর, এখন আমি দেখাইতে চাই যে কংগ্রেসীরা খাদির প্রসারের জন্য কি করিতে পারেন ও তাঁহাদের কর্তব্য কি।

খাদি উৎপাদনের ভিতর কাপাসের চাষ, কাপাসের ফসল তোলা, কাপাস ডলাই, সাফ করা, ধোনা, পাঁজ তৈয়ারী করা, সুতাকাটা, মাড় দেওয়া, রং করা, টানা ও পড়েন তৈরী, ধোলাই এই সবই পড়ে। এক রং করা ছাড়া বাকী সবগুলিই ইহার অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া। ইহার প্রত্যেকগুলি গ্রামের ভিতর ঠিকভাবে কার্যকরী করা যায় এবং আজ অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘের চেষ্টায় ভারতের বহুগ্রামে এই প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইতেছে। সর্বশেষ কার্য বিবরণীতে এই হিসাব পাওয়া যায়ঃ—

১৯,৬৪৫ জন হরিজন ও ৫৭,৩৭৮ জন মুসলমান সমেত ২৭৫,১৪৬ জন গ্রামবাসী, যাহারা ১৩৪৫১ খানি গ্রামে বাস করে। তাহারা সুতা কাটিয়া ও বস্ত্র বয়নাদি করিয়া ১৯৪০ সালে ৩৪,৮৫,৬০৯ টাকা উপার্জন করিয়াছে। যাহারা সুতা কাটে তাহাদের অনেকেই স্ত্রীলোক।

যদি কংগ্রেসীরা সদ্‌ভাবে খাদি কর্মপদ্ধতি হাতে লইতেন তবে যাহা করা যাইত, যাহা করা হইয়াছে তাহা তাহার সতাংশ মাত্র। যখন হইতে গ্রামের এই কেন্দ্রীয় শিল্পটি ও ইহার আনুসঙ্গিক শিল্পগুলি খেলাচ্ছলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন হইতেই আমাদের গ্রাম হইতে বুদ্ধি ও উজ্জ্বলতা অন্তর্হিত হইয়াছে। গ্রামগুলিকে অন্তঃসারশূন্য, জ্যোতিহীন করিয়া গ্রাম্য অযত্নরক্ষিত পশুদের মত অবস্থাতেই তাহাদিগকে আনিয়া ফেলিয়াছে।

যদি কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের খাদির আহ্বানে সত্যই সাড়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা অখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ হইতে সময় সময় খাদি পরিকল্পনায় তাঁহাদের ভাগ লওয়ার জন্য যে আবেদন আসে তাহা কার্যে পরিণত করিবেন। তথাপি আমি এখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সন্নিবেশিত করিতেছি।

(১) যাঁহাদের একটু করিয়া জমি আছে, এমন প্রত্যেক পরিবারই অন্ততঃ নিজের পরিবারের উপযোগী তুলা জন্মাইতে পারেন। তুলার চাষ করা সহজ। বিহারে আইনের জবরদস্তিতে চাষাদিগকে তাহাদের বিঘাপ্রতি তিন কাঠা করিয়া জমিতে নীল উৎপন্ন করিতে হইত। বিদেশী নীলকরদের স্বার্থের জন্য তাহাদের বাধ্য হইয়া ইহা করিতে হইত। তবে আমরা কেন আমাদের জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের জমির কতকটা অংশে তুলা উৎপন্ন করিব না? পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, খাদি প্রক্রিয়ার সুরু হইতেই বিকেন্দ্রীকরণ আরম্ভ হয়। আজিকার দিনে তুলার চাষ কেন্দ্রীভূত এবং রেলে করিয়া তুলা ভারতের বিভিন্ন স্থানে লইতে হয়। যুদ্ধের পূর্বে ইহার অনেকটা বৃটেনে ও জাপানে যাইত। যুদ্ধের পূর্বে এবং আজও তুলা কৃষককে নগদ টাকা দেওয়ার মত ফসলই আছে। আর সেইজন্যই ইহা বাজারের উঠ্‌তি পড়্‌তির উপর নির্ভরশীল। খাদি পরিকল্পনা অনুসারে কাপাস উৎপাদন এই অনিশ্চয়তা ও জুয়ার ভাব হইতে মুক্ত। চাষী তাহার প্রয়োজন অনুরূপ উৎপাদন করিবে। চাষীর ত এই কথাই বুঝা দরকার যে তাহার প্রধান কর্তব্য হইতেছে নিজ প্রয়োজন অনুরূপ উৎপন্ন করা। যদি তাহাই করে, তবে বাজার মন্দা বলিয়া তাহার সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাই কমিয়া যায়।

২। যদি নিজের ঘরে কাপাস না থাকে, তবে সুতা কাটার জন্য প্রয়োজন মত কাপাস প্রত্যেক কাটুনীই খরিদ করিবে। আর সেই কাপাস সে সহজেই হাতে চালান কেরকীতে ডলাই করিয়া লইতে পারে। তাহার নিজের যতটুকু প্রয়োজন তাহা ত একখানা কাঠের

উপর একটা লোহার শিক রগড়াইয়াই ডলিয়া লইতে পারে। যেখানে ইহা করা সম্ভব নয়, সেখানে হাতে ডলাই করা কাপাসই কিনিয়া আনিয়া ধুনিতে হইবে। নিজের জন্য যাহা প্রয়োজন, ততটুকু তুলা ছোট একটা ধনুকেই ধুনিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ পরিশ্রম নাই। কাজটা যতই বিকেন্দ্রীকৃত হয়, ততই যন্ত্রগুলি সহজ ও সস্তা হইয়া পড়ে। পাঁজ করার পর সুতা কাটার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতা কাটার জন্য আমি ধনুষ-তকলি ব্যবহার করিতে বলি। আমি আজকাল প্রধানতঃ ইহাই ব্যবহার করিতেছি। চরখায় আমি যত দ্রুত সুতা কাটিতে পারি, ইহাতেও প্রায় তাহাই পারি। বরঞ্চ এই তকলির সুতা আর একটু সূক্ষ্ম হয় এবং বেশী শক্ত ও সমান হয়। তবে এ কথা সকলের পক্ষে না খাটিতে পারে। আমি ধনুষ-তকলি ব্যবহার করিতে বলি এইজন্য যে ইহা সহজেই তৈরী করা যায়। ইহা বেশ সস্তা ও চরখা মেরামতে রাখার যে হাঙ্গামা তাহা ইহাতে নাই। যদি মালদড়ি কেমন করিয়া করা হয় তাহা জানা না থাকে অথবা মালদড়ি পিছলাইলে কি করিতে হয় অথবা চরখা অচল হইলে কি করিয়া চালু করিতে হয়, যদি জানা না থাকে তবে চরখা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া যদি লাখ লাখ লোককে সুতা কাটিতে হয়—আর যুদ্ধের চাপে সে অবস্থা আসিতেই পারে—তবে ধনুষ-তকলি সহজে নির্মিত ও ব্যবহার-যোগ্য যন্ত্র বলিয়া কেবল ইহাই কার্য উপযোগী হইতে পারে। সাধারণ তকলি অপেক্ষাও ইহা তৈরী করা সহজ। একবার কল্পনা করুন, জাতীর সমস্ত লোক কাপাস হইতে আরম্ভ করিয়া সুতা কাটার কার্য্য করিতেছে। তবে সমস্ত জাতির উপর উহার ঐক্যবিধায়ক ও শিক্ষাপ্রদ প্রভাব কত বড় হইবে। বিবেচনা করুন, ধনী-দরিদ্রের ভিতর একই শ্রমের যোগে যুক্ত হওয়ায় সমতার ভাব কত কার্যকরী হইবে।

এইভাবে প্রস্তুত সুতা তিনটি উপায়ে ব্যয় করা যাইতে পারে:—দরিদ্রের সাহায্যের জন্য ইহা চরখা-সঙ্ঘকে দান করা যাইতে পারে। নিজের ব্যবহারের জন্য ইহা বুনাইয়া লওয়া যাইতে পারে, অথবা ইহার

বদলে যতটা পাওয়া যায় ততটা খাদি লওয়া যাইতে পারে। এ কথা ত স্পষ্ট যে, সুতা যত সুক্ষ্ম হইবে ও উৎকৃষ্ট হইবে উহার মূল্যও তত বেশী হইবে। যদি কংগ্রেসীরা এই কাজে মন লাগান, তবে তাঁহারা ব্যবহৃত যন্ত্রাদিতে উন্নতি আনিতে পারিবেন এবং অনেক কিছু আবিষ্কারও করিবেন। আমাদের দেশে শ্রমের সহিত বুদ্ধি-শক্তির একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে কর্মপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রম ও বুদ্ধির যদি অচ্ছেদ্য সংযোগ হয় এবং যদি উপরি উক্ত উপায়ে উহা সাধিত হয়, তবে উহা দ্বারা অপরিমেয় হিত হইবে।

জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এই যে যান্ত্রিক সুতা কাটার পরিকল্পনা, তাহাতে সাধারণ নরনারী দৈনিক একঘণ্টা সময় দিলেই হইবে। ইহার বেশী আমি আশা করি না।

## ৫। অপর গ্রাম্যশিল্প

অপর সকল শিল্পের ভিত্তি খাদি হইতে ভিন্ন প্রকারের। ঐ সকল কাজে স্বেচ্ছামূলকভাবে খাটিবার ক্ষেত্র কম। প্রত্যেক শিল্পেই গুটিকতক লোকের শ্রমের আবশ্যক। এই সকল শিল্প খাদির সহায়কের স্থান লইয়া আছে। খাদি ছাড়া এগুলি বাঁচিতে পারে না। আর এগুলি না থাকিলে খাদির মর্যাদাও আবার অনেকখানি মলিন হইবে। গ্রাম্য অর্থনীতির পূর্ণতা প্রাপ্তি ততক্ষণ হইবে না, যতক্ষণ না মৌলিক গ্রাম্য শিল্পগুলির, যথা—হাতে তৈরী আটা, ঢেঁকাছাটা চাউল, সাবান তৈরী, কাগজ তৈরী, দেশলাই তৈরী, চামড়া পাকাই, ঘানিতে তেল তৈরী ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কংগ্রেসীরা এই সকল শিল্পে মন দিতে পারেন। আর যদি তাঁহারা গ্রামবাসী হন অথবা গ্রামে বসিয়াই যান, তবে তাঁহারা এই সকল শিল্পকে নবজীবন এবং নূতন রূপ দিবেন। সকলেরই এই সৎসঙ্কল্প লওয়া চাই যে, সব সময়ে সকল স্থানে কেবল গ্রামজাত বস্তুই ব্যবহার করিবেন। যদি চাহিদা হয় তবে এ বিষয় সন্দেহ নাই যে, আমাদের যাহা আবশ্যক তাহা গ্রাম হইতেই

মিটিতে পারে। যখন আমরা গ্রাম্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইব, তখন আমাদের পশ্চিমের নকল বস্তুর আবশ্যক হইবে না অথবা যন্ত্রনির্মিত দ্রব্যের আবশ্যক হইবে না। পরন্তু তখন আমরা এমন একটা খাঁটি স্বদেশী রুচির পোষক হইব, যাহা নব ভারতের কল্পনার পরিপোষক হইবে—যে নব ভারতে না থাকিবে বৃত্তিহীনতা এবং অনাহার, এবং যেখানে আলস্য বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে না।

## ৬। গ্রাম্য পরিচ্ছন্নতা

শ্রমের সহিত বুদ্ধির সহযোগিতার অভাব হওয়ায় গ্রামের উপর অমার্জনীয় অবহেলা উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য সুচারু গ্রামের শোভায় দেশ শোভিত না হইয়া আমরা দেখিতেছি কেবল আঁস্তাকুড়েরই সমাবেশ। অনেক গ্রামেরই প্রবেশপথ এমন যে, প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। এমনি আবর্জনা ও দুর্গন্ধ থাকে যে, লোকের চোখ বুজিয়া নাকে কাপড় চাপা দিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের কংগ্রেসীদের বেশীর ভাগই ত গ্রাম্য লোক। যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের গ্রামগুলি পরিচ্ছন্নতার আদর্শ হইয়া থাকিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রামবাসীদের সহিত তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় এক হইয়া যাওয়া যে কংগ্রেসীদের কর্তব্য তাহা তাহারা কখনও মানেন নাই। জাতীয় বা সামাজিক পরিচ্ছন্নতার বোধ বলিয়া যে গুণ আছে, তাহা আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা কোনও রকমে স্নানটা সারিয়া লই বটে, কিন্তু যে কূপে বা জলাশয়ে বা নদীতে আমরা স্নান করিয়া শুচি হই, সেই কূপ, তড়াগ বা নদীতীর নোংরা করিতে আমাদের আটকায় না। এই ত্রুটী একটা বড় অপরাধ বলিয়া আমি মনে করি। এই কারণেই আমাদের গ্রামগুলি নিন্দনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে ও আমাদের পবিত্র নদীগুলির পবিত্র তটভূমিগুলি কলঙ্কিত হইতেছে এবং অপরিচ্ছন্নতাজনিত রোগ আমাদিগকে ক্লিষ্ট করিতেছে।

## ৭। নূতন বা বনিয়াদি শিক্ষা

এই বিষয়টা নূতন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ইহাতে এতটা আগ্রহ দেখান যে, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে সম্মতির ছাপ দেন। এই সঙ্ঘ হরিপুরা কংগ্রেসের সময় হইতে কাজ করিয়া আসিতেছে। অনেক কংগ্রেসীর পক্ষে ইহা একটা বিরাট কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। এই শিক্ষা গ্রাম্য শিশুদিগকে আদর্শ গ্রামবাসী করার জন্য পরিকল্পিত। ইহা তাহাদের উপযোগী করিয়াই গঠিত। ইহার অনুপ্রেরণা গ্রাম হইতেই আসিয়াছে। যে সকল কংগ্রেসীরা স্বরাজের ইমারত ভিত্তি হইতে পাকা করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা শিশুদিগকে অবহেলা করিতে পারেন না। বৈদেশিক শাসন নিশ্চিতরূপে অথচ অলক্ষ্যে শিশুদিগের শিক্ষার ভিতর দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিও একটা তামাসা বিশেষ। কিন্তু গ্রামের প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখা যাউক, আর শহরের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতেই দেখা যাউক, গ্রামের ছেলেই হউক আর সহরের ছেলেই হউক, বনিয়াদী শিক্ষা এই ছেলেদের ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী তাহার সহিত যোগযুক্ত করে। ইহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই বিকাশ হয় এবং শিশুকে তাহার জন্মস্থানের সহিত গভীর সম্বন্ধযুক্ত করে। ইহাতে একটা ভবিষ্যতের গৌরবময় কল্পনা লক্ষ্য করিয়া পাঠদ্দশাতেই বালক বা বালিকা নিজের কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়। এই কাজ কংগ্রেসীরা খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণীয় বলিয়া দেখিবেন—আর যে ছেলেদের সংস্পর্শে তাঁহারা আসিবেন, তাহা-দিগকেও আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিবেন। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন সেবাগ্রামে সঙ্ঘের কর্মসচিবের সহিত যোগযুক্ত হন।

## ৮। বয়স্কদিগের শিক্ষা

কংগ্রেসীরা এই কাজটা এত অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন যে তাহা দুঃখদায়ক। যেখানে অবহেলা করেন নাই, সেখানে অশিক্ষিতদিগকে

কেবল লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি আমার হাতে বয়স্কদের শিক্ষার ভার থাকিত, তবে আমি শিক্ষার্থীদের মন খুলিয়া দিবার ব্যবস্থাই হাতে লইতাম এবং তাহাদিগকে বুঝিতে দিতাম যে, তাহাদের দেশ কত মহান ও কত বড়। গ্রামবাসীর ভারতবর্ষ ত তাহার কাছে তাহার গ্রামের মধ্যেই নিবদ্ধ। সে যদি অন্য গ্রামে যায়, তবে সে তাহার নিজের গ্রামকেই তাহার গৃহ বলিয়া ভাবে, সেই গ্রামের গল্প করে। হিন্দুস্থান তাহার নিকট একটা ভূগোলের কথা মাত্র। গ্রামবাসীদের ভিতর যে কি পরিমাণ অজ্ঞতা আছে, সে বিষয় কোনও ধারণাই আমাদের নাই। বিদেশী শাসন ও তাহার দুঃখদায়ক পরিণামের বিষয় গ্রামবাসী কিছুই জানে না। যে সামান্য জ্ঞান এই বিষয় সে সংগ্রহ করে, তাহাতে বিদেশীকে দেখিয়া সে ভয়ে অভিভূত হয় এবং নিজের অসহায়তার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়। ফলে বিদেশীর প্রতি ও তাহার শাসনপদ্ধতির প্রতি ভীতি ও ঘৃণার ভাব উপস্থিত হয়। ইহা হইতে কিসে মুক্তি হইতে পারে, সে ধারণাই তাহাদের নাই। তাহারা এ কথা জানে না, বিদেশীরা যে এখানে আছে তাহা তাহাদেরই দুর্বলতার জন্য এবং বিদেশী শাসন দূর করার সামর্থ যে তাদের নিজেদেরই আছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্যই সেই শাসন চলিতেছে। এই হেতু আমার পরিকল্পিত বয়স্কদের শিক্ষা মানে কথায় কথায় তাহাদিগকে সত্যকার রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া। এই জিনিষটা সুপরিকল্পিত করা যাইতে পারে বলিয়া নির্ভয়ে এই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয়, আজকার দিনে কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই ধরণের শিক্ষা প্রচেষ্টায় ব্যাঘাত উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। যদিও ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তবে তাহা দূর করার জন্য এবং এই প্রাথমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িতেই হইবে—আর ইহা না করিতে পারিলে স্বরাজের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না। অবশ্য যাহা কিছু আমি লিখিতেছি, তাহার ভিতর খোলাখুলি কাজ করার কথাই রহিয়াছে। অহিংসা ভয়কে ঘৃণা করে এবং সেই হেতু গোপনীয়তাও বর্জন করে। মুখেমুখে শিক্ষা

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুঁথিগত বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা স্বয়ংই একটা বিশেষ বিষয়। অক্ষর শিক্ষাকাল যাহাতে কমান যায়, তাহার জন্য অনেকগুলি পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষজ্ঞদের একটা সাময়িক বা স্থায়ী বোর্ড গঠন করিতে পারেন, যাহাতে উপরের পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার পথ পাওয়া যায় ও কর্মীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়। এ কথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, যাহা কিছু আমি বলিলাম উহাতে কেবল পথই দেখান হইতেছে, কিন্তু সাধারণ একজন কংগ্রেসী কি করিয়া সে কাজ আরম্ভ করিবে, তাহা বলা হইতেছে না। আবার সকল কংগ্রেসীই এই বিশেষজ্ঞের কাজের যোগ্যও নহেন। কিন্তু যে সব কংগ্রেসীদের বৃত্তিই শিক্ষকতা, তাঁহাদের পক্ষে উপরের কল্পনা অনুযায়ী একটা শিক্ষাক্রম স্থির করা কঠিন হইবে না।

## ৯। নারী উন্নয়ন

গঠনমূলক কার্যের ভিতর আমি নারীদের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। কেননা যদিও সত্যাগ্রহ আন্দোলন নারীদিগকে অন্ধকার হইতে এমনভাবে টানিয়া বাহির করিয়াছে যেমন আর কিছুতেই এত অল্প সময়ে সম্ভব হইত না, তথাপি কংগ্রেসীরা সে প্রেরণা অনুভব করেন নাই, যাহাতে তাঁহারা নারীদিগকে স্বরাজের জন্য যুদ্ধে পুরুষের সমান অংশগ্রহণকারিণী বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। তাঁহারা এ কথা অনুভব করেন নাই যে, সেবার ব্রতে নারীই পুরুষের সত্যকার সহায়ক। পুরুষের রচিত আচার ও নিয়মের শৃঙ্খলে নারীদিগকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল নিয়ম গঠনে নারীদের কোনই হাত ছিল না। অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার পরিকল্পনায় পুরুষের পক্ষে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণের যতটা স্বাধীনতা আছে, নারীদের পক্ষে তাহাদের লক্ষ্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণের ঠিক ততটা অধিকারই রহিয়াছে। আবার অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত সমাজে প্রত্যেক অধিকারই

কোনও কর্তব্য পালনের ফলে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই কথাই দাঁড়ায় যে, সামাজিক আচরণের নিয়ম উভয়ের সহযোগিতায় ও পরামর্শ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল নিয়ম কদাচ বাহির হইতে চাপান যায় না। পুরুষেরা নারীদের প্রতি ব্যবহারে এই সত্যটা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাহারা নিজেদিগকে নারীদেরপ্রভু, কর্তা প্রভৃতি মনে করিয়াছে। বন্ধু ও সহকর্মী এই দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখে নাই। কংগ্রেসীদের এখন গৌরবময় কর্তব্য হইতেছে নারীদিগকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লওয়া। নারীদের অবস্থা সেকালের সেই ক্রীতদাসের মত, যাহারা এ কথা কখনো ভাবিতেও পারিত না যে কোনও দিন তাহারা স্বাধীন হইতে পারে। তারপর যখন স্বাধীনতা আসে, তখন ক্রীতদাসেরা সাময়িকভাবে নিজেদিগকে অসহায় মনে করে। নারীদিগকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা পুরুষের দাসী। কংগ্রেসীদের কর্তব্য হইতেছে ইহা দেখা যে নারীরা তাহাদের পূর্ণ দায়িত্বের বোধ পায় এবং পুরুষের সঙ্গে সমানে তাহাদের যোগ্য স্থান অধিকার করে।

যদি মন তৈরী থাকে তবে এই ধরণের বিপ্লব সহজেই সংঘটিত হয়। কংগ্রেসীরা এই কাজটা তাঁহাদের নিজেদের গৃহেই আগে আরম্ভ করিয়া দিন। স্ত্রীদিগকে খেলার পুতুল ও আমোদের পাত্রী না বানাইয়া তাহাদিগকে সেবার ক্ষেত্রে মাননীয়া সহযোগিনার স্থান তাঁহারা দিন। এই প্রচেষ্টায় যাঁহারা ভাল শিক্ষা পান নাই, তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীদের নিকট হইতে যথাসম্ভব শিক্ষা প্রাপ্ত হউন। একই নীতি যথাযোগ্য পরিবর্তনসহ মাতা ও কন্যাদের প্রতিও প্রযোজ্য হইবে।

এ কথা স্বীকার করা অনাবশ্যক যে আমি ভারতীয় নারীদের অসহায় অবস্থায় একদেশদর্শী চিত্রই আঁকিয়াছি। আমি এ কথা বেশ জানি যে গ্রামে সাধারণতঃ নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষভাবে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রভুত্বও করে। কিন্তু নিরপেক্ষ কোনও দ্রষ্টার নিকট আইনগত ও আচারগতভাবে নারীদের অবস্থা বস্তুতই সর্বথা খারাপ এবং উহার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।

## ১০। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-জ্ঞান।

গ্রাম পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে একবার বলিয়া আবার স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কথা অবতারণার মানে কি এ কথা উঠিতে পারে। গ্রাম পরিচ্ছন্নতার সহিত এই বিষয় একযোগে বিচারিত হইতে পারিত, কিন্তু পদ কয়টা লইয়া আর পরিবর্তন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। কেবল পরিচ্ছন্নতার উল্লেখই স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিজের শরীর সুস্থ রাখা ও শরীর পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ও ব্যবহারে পরিণত করা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। সুগঠিত সমাজে নাগরিকেরা স্বাস্থ্যের ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম জানে ও পালন করে। এ কথা অবিসংবাদীভাবে সত্য যে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানের অভাববশতঃ অধিকাংশ রোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের ভিতর মৃত্যুসংখ্যার আধিক্যের হেতু যে আমাদের তীব্র দারিদ্র্য, সে কথা সত্য। তবুও উহা কতকটা কমান যাইত, যদি লোক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান পাইত।

সুস্থ দেহ সুস্থ মনের বাসভূমি, ইহা মানুষের প্রথম আবিষ্কৃত নিয়ম এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মন ও শরীরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য সংযোগ আছে। যদি আমরা সুস্থ মনের অধিকারী হই, তবে আমরা স্বতঃই হিংসা বর্জন করিব এবং স্বভাবতঃ স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিয়া আমরা বিনা প্রয়াসে সুস্থ দেহসম্পন্ন হইব। সেইজন্য আমি আশা করি কোনও কংগ্রেসীই গঠনমূলক কার্যের এই পদটি অবহেলা করিবেন না। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নিয়মগুলি সহজ এবং শিক্ষাও সহজেই করা যায়। উহা পালন করা কঠিন। সেইগুলি এই :—

পবিত্রতম চিন্তা করিবে ও সমস্ত অলস ও অপবিত্র চিন্তা বর্জন করিবে।

রাত্রিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে।

সোজা হইয়া দাঁড়াইবে, সোজা হইয়া বসিবে এবং প্রত্যেক কাজকর্মে পরিচ্ছন্ন থাকিবে। তোমার বাহ্য শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা যেন তোমার আভ্যন্তরীণ শুচিতার পরিচায়ক হয়।

২১৮২

জনসাধারণের সেবায় বাঁচিয়া থাকার জন্যই আহার করিবে। নিজের ব্যসন চরিতার্থ করার জন্য আহার করিবে না। সেই হেতু তোমার শরীর ও মন যথাযোগ্য অবস্থায় রাখার জন্য যতটা প্রয়োজন, ততটা আহার করিবে। মানুষ যাহা খায় তাহাই হয়।

তোমার ব্যবহারের খাদ্য, পানীয় ও হাওয়া যেন পরিচ্ছন্ন হয়। কেবল ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না, পরন্তু নিজে যে ত্রিবিধ পরিচ্ছন্নতা চাও, তোমার আবেষ্টন সেই পরিচ্ছন্নতায় পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

## ১১। প্রাদেশিক ভাষা

আমাদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষার প্রতি অধিক প্রীতির জন্য আমাদের শিক্ষিত ও রাজনৈতিক মনোভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, আর ভারতের ভাষা দরিদ্রতর হইয়াছে। আমরা মাতৃভাষায় কোনও জটিল চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার বৃথা চেষ্টায় গোলে পড়িয়া যাই। বৈদেশিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ পাই না। ইহার ফল বিষম হইয়াছে। জনসাধারণ বর্তমান যুগের চিন্তাধারা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে। ভারতবর্ষের মহান ভাষাগুলির অবহেলা দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, নিজেদের সময়কালের নৈকট্যবশতঃ তাহা আমরা ঠিকমত মাপ করিতে পারিতেছি না। যদি আমরা এই অন্যায়ের প্রতিকার না করি, তবে জনসাধারণের মন অজ্ঞতায় রুদ্ধ হইয়া থাকিবে একথা বুঝা সহজ। জনসাধারণ তাহা হইলে স্বরাজের প্রতিষ্ঠায় কোনও বড় সাহায্য করিতে পারিবে না। অহিংসার উপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ইহা অন্তর্নিহিত সত্য যে প্রত্যেক লোকই স্বাধীনতার আন্দোলনে তাহার নিজ অংশ গ্রহণ করিবে। যদি তাহারা প্রত্যেকটি বিষয় ও তাহার ভিতরের অর্থ না বুঝে তবে জনসাধারণ ভাল করিয়া এই কাজ করিতে পারিবে না। তাহাদের নিজেদের ভাষায় ইহা না বুঝাইলে, তাহারা বুঝিতেও পারিবে না।

## ১২। রাষ্ট্রভাষা

তাহা ছাড়া সারা ভারতের চিন্তা বিনিময়ের জন্য আমাদের ভারতীয় ভাষা হইতে একটা ভাষা চাই, যাহা অধিক সংখ্যক লোক বর্তমানে জানে এবং যাহা অপর সকলে সহজেই শিখিতে পারে। এই ভাষা অবিসংবাদীভাবেই হিন্দী ভাষা। উত্তর ভারতের হিন্দু মুসলমানেরা এই ভাষা বুঝে ও ইহাতে কথা বলে। পার্শি অক্ষরে লিখিলে ইহাকে উর্দু বলা হয়। ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে কংগ্রেস এক বিখ্যাত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই সর্বভারতীয় ভাষাকে 'হিন্দুস্থানী' নাম দেন। সেই হইতে অন্ততঃ নিয়মানুযায়ী এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। আমি নিয়মানুযায়ী এই জন্য বলিতেছি যে, সকল কংগ্রেসীরাও ইহা কার্যতঃ যতটা করা উচিত, ততটা প্রয়োগ করেন নাই। ১৯২০ সালে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতির একটা সঙ্কল্পিত চেষ্টা আরম্ভ হয়। আবার সারা ভারতের জন্য একটা সাধারণ ভাষা গ্রহণের চেষ্টাও চলে, যে ভাষায় বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কথা বলিতে পারেন ও বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসীরা কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন কালে যে ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। এই রাষ্ট্রীয় ভাষা উভয় প্রকার কথন পদ্ধতিতে বলিতে ও উভয় লিপিতে (নাগরী ও উর্দু) লিখিতে শিখাইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসী এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সেইজন্য আমাদের লজ্জাকর দৃশ্য দেখিতে হয় যখন কংগ্রেসীগণ ইংরাজী বলিতে জেদ করেন এবং অপরেও তাঁহাদের সুবিধার জন্য ইংরাজী যাহাতে বলে তাহাতে বাধ্য করেন। ইংরাজী ভাষা যে মোহে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা এখনো ভাঙ্গে নাই। আর এই মোহে অভিভূত হইয়া থাকায় ভারতের পক্ষে নিজ লক্ষ্যে পঁহুছিবার চেষ্টায় আমরা বিঘ্ন ঘটাইতেছি। জনসাধারণের জন্য আমাদের ভালবাসা খুবই ভাসা ভাসা বলিয়াই প্রমাণিত হইবে,

যদি আমরা ইংরাজী শিখিতে যত বৎসর ব্যয় করি হিন্দুস্থানী শিখিতে সেই কয়টা মাসও দিতে না চাই।

## ১৩। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠা

অহিংসার আশ্রয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এই শেষোক্ত বিষয়টি প্রধান চাবিকাঠি স্বরূপ। আর্থিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা মানে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে আবহমান কালের যে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা শেষ করা। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যে মুষ্টিমেয় ধনীসমূহ জাতীয় ধনসম্পদের মালিক হইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থার সঙ্কোচ করা এবং অপরপক্ষে ক্ষুধাপীড়িত নগ্ন জনসাধারণের অবস্থার কথঞ্চিত উন্নয়ন করা। যতদিন পর্যন্ত ধনী ও ক্ষুধিত কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রহিয়া যাইবে, ততদিন অহিংসার পথে শাসনপ্রথার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব থাকিবে।

নয়াদিল্লীর প্রাসাদাবলীর সহিত দরিদ্র শ্রমজীবীদের কুটীরের অসামঞ্জস্য স্বাধীন ভারতে একদিনও বরদাস্ত হইবে না, কেননা সেই ভারতের রাজ্য শাসনে দরিদ্রেরাও ধনীদের মত সমান ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে। ধনীরা তাহাদের ধন ও ধন হইতে উৎপন্ন ক্ষমতা যদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করে এবং তাহাদের সম্পদ যদি সাধারণের কল্যাণের জন্য বাঁটিয়া না দেয়, তবে রক্তাক্ত ও হিংস্র বিপ্লব যে একদিন দেখা দিবে সে কথা নিশ্চিত।

আমি ট্রাষ্ট বা অছিত্বের নীতির বিষয় যে কথা বলিয়াছি, সেই ধারণার উপর যদিও অনেক বিদ্রূপ বর্ষিত হইয়াছে তবুও আমি তাহাই আজিও মানি। একথা সত্য যে ঐ অবস্থা লাভ করা কঠিন। আমরা ১৯২০ সালেই এই সঙ্কটময় পর্বত উত্তীর্ণ হইবার সঙ্কল্প লই। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার জন্য চেষ্টা করা ভাল।

ইহার ভিতর অহিংসার প্রয়োগের জন্য প্রতিদিনের ক্রমবর্ধমান নিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে। আশা করা যায় যে কংগ্রেসীরা অনুসন্ধান

করিবেন এবং তাঁহাদিগকে যাহা করিতে বলা হয় তাহার যুক্তি নিজে নিজে বুঝিয়া অহিংসা কেন ও কি তাহা স্থির করিবেন। তাঁহারা নিজেদিগকেই প্রশ্ন করিবেন যে বর্তমান অসমতা কেমন করিয়া দূর করা যায়—হিংসার পথেই হউক অথবা অহিংসার পথেই হউক। আমার মনে হয় হিংসার পথে কি করা যায়, তাহা আমরা জানি। কোনও জায়গায় হিংসা দ্বারা কাজ হাসিল হয় নাই।

আমাদের অহিংসার পথের পরীক্ষা এখনো গড়িয়া উঠিতেছে। লোককে দেখাইবার মত আজ তেমন কিছু একটা আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমি দেখিতেছি যে এই প্রথা কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যদিও খুবই ধীরে তবুও ধনসমতার দিকে কার্যকরী হইতেছে। অহিংসার পথ হৃদয় পরিবর্তনের পথ বলিয়া যদি পরিবর্তন একবার ঘটে, তবে তাহা স্থায়ীই হইবে। যে সমাজ বা জাতি অহিংসার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর ভিতর বা বাহিরের আঘাত সে সহিয়া উঠিতে পারিবে। আমাদের কংগ্রেস সংস্থায় অর্থশালী লোক আছেন। তাঁহাদেরই পথপ্রদর্শক হইতে হয়। এই সংগ্রাম আমাদের শেষ সংগ্রাম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এই হেতু প্রত্যেক কংগ্রেসীর ব্যক্তিগতভাবে আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্র রহিয়াছে। যদি ভবিষ্যতে কোনোকালে আমাদিগকে ধনসমতা লাভ করিতে হয়, তবে এখন তাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়। যাঁহারা এ কথা মনে করেন যে বড বড় সংস্কারগুলি স্বরাজ লাভের পরে হইবে, তাঁহারা অহিংস স্বরাজ সক্রিয় করিবার প্রাথমিক সূত্রের সম্পর্কে নিজেদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন। একদা কোনও শুভপ্রাতঃকালে এই প্রকার স্বরাজ আকাশ হইতে আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে না। উহা দিনে দিনে যেমন রাজমিস্ত্রী ইটের উপর ইট গাঁথে, তেমনি করিয়া সংঘবদ্ধ আত্মপ্রয়াস দ্বারা লাভ করিতে হইবে। আমরা উহার পত্তনের দিকে বেশ খানিকটা অগ্রসর হইয়াছি। কিন্তু এখনো অনেক দীর্ঘ ক্লান্তির পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে—যাহার পর আমরা

গৌরবের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত স্বরাজের দর্শনলাভ করিতে পারিব। প্রত্যেক কংগ্রেসীই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে ধনসমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজে কি করিয়াছেন।

## ১৪। কিষাণ

এই কর্মপদ্ধতির বিবরণে সমস্তই নিঃশেষ করিয়া ধরা হয় নাই। স্বরাজের গঠন বিপুল। আশীকোটী হাতের শ্রমে উহা গড়িয়া উঠিবে। ইহাদের মধ্যে কিষাণ অর্থাৎ চাষীরাই সর্বাধিক সংখ্যক।

বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই (অনুমান শতকরা ৮০ ভাগের বেশী) কিষাণ বলিয়া কিষাণেরাই কংগ্রেস হইবে, কিন্তু তাহারাও আজ কংগ্রেস নয়। যখন তাহারা তাহাদের অহিংস শক্তির বিষয় অবহিত হইবে, তখন জগতের কোনও শক্তিই তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পদাধিকারের জন্য কিষাণদিগকে ব্যবহার করা উচিত হইবে না। আমি ইহা অহিংস পন্থার বিপরীত বলিয়া মনে করি। যাঁহারা কিষাণ সম্পর্কে আমার প্রবর্তিত নীতির অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা চম্পারণ আন্দোলনটা বুঝিয়া দেখিতে পারেন। সেইখানেই সর্বপ্রথম ভারতে সত্যাগ্রহ পরীক্ষিত হয় এবং তাহাতে যে ফল হয় তাহা সকলেই জানেন। উহা একটা গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। উহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অহিংস থাকে। প্রায় বিশ লক্ষ কিষাণ উহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সংগ্রামটা এমন একটা বিশেষ অন্যায় সম্পর্কে করা হইয়াছিল, যাহা এক শতাব্দী-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এই অন্যায়ের প্রতীকারের জন্য কয়েকবার হিংস্র বিপ্লব হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই উহা দমিত হয়। অহিংস বিপ্লব কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে। চম্পারণের কৃষকেরা কোনও বিশেষ প্রচেষ্টা ব্যতীতই রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে।

অহিংসার ক্রিয়াশীলতার যে পদার্থপাঠ কিষাণেরা পায়, তাহাই তাহাদিগকে কংগ্রেসে আকৃষ্ট করে। শ্রীব্রজকিশোর বাবু ও রাজেন্দ্র বাবুর অধিনায়কত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে তাহারা নিজেদের সার্থকতার পরিচয় দেয়।

পাঠকগণ খেড়া, বারডৌলী ও বোরসাদের কিষাণ অন্দোলন পাঠ করিয়াও লাভবান হইতে পারেন। ইহার কৃতকার্যতার মূল হইতেছে এই যে, কিষাণদিগকে তাহাদের নিজ ব্যাক্তিগত ও অনুভূত অন্যায়ের প্রতীকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত রাজনৈতিক কারণে নিয়োজিত করা হইতে বিরত থাকা। একটা বিশিষ্ট অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থার অবলম্বন তাহারা বুঝিতে পারে। অহিংসা সম্পর্কে উপদেশাবলী তাহাদের জন্য প্রয়োজন হয় না। তাহারা এমন একটা কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োগ করে, যাহা তাহারা নিজেরা বুঝিতে পারে। তাহার পর যখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত পন্থাই অহিংস পন্থা, তখন তাহারা উহাই অহিংসা বলিয়া বুঝিতে পারে।

যে সমস্ত কংগ্রেসী ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এইসকল উদাহরণ হইতে বুঝিয়া লইতে পারিবেন যে, কিষাণদের মধ্যে কেমন করিয়া কি কাজ করা যাইতে পারে। আমি এ কথা মানি যে, কতক কংগ্রেসী যেভাবে কিষাণদিগকে সংগঠিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ভাল কিছুই হয় নাই—হয়ত বা তাহাদের অনিষ্টই হইয়াছে। এই ধরণের কতক কর্মীর প্রশংসায় এ কথা বলিতে হয় যে, তাঁহারা সাফ সাফ স্বীকার করেন যে তাঁহারা অহিংসার পথে বিশ্বাস করেন না। এই ধরণের কর্মীদের প্রতি আমার এই পরামর্শ যে, তাঁহারা যেন কংগ্রেসের নাম ব্যবহার না করেন এবং কংগ্রেসী বলিয়া পরিচয় না দেন।

পাঠক এক্ষণে বুঝিবেন যে, আমি কেন কিষাণ ও মজুরদিগকে অখিল ভারত সংস্থাভুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে নামি নাই। আমি ত কতই ইচ্ছা করি যে, সকল হাতই যেন এক দিকেই নৌকা ঠেলে!

কিন্তু আমাদের দেশের মত এত বড় বিস্তীর্ণ দেশে হয়ত উহা অসম্ভব। সে যাহাই হউক, অহিংসার ভিতর কোনও বল প্রকাশের অবসর নাই। এক দিকে সাফ যুক্তি এবং অপর দিকে অহিংসাপ্রসূত কর্মের দৃষ্টান্তের উপর কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ভর করিতে হইবে। আমার অভিমত এই যে যেমন মজুরদের জন্য আছে, তেমনি কিষাণদের জন্যও কংগ্রেসের ভিতর একটি বিভাগ থাকা চাই, যাহাতে কিষাণদের বিশেষ সমস্যাগুলি বিবেচিত হইবে।

## ১৫। শ্রমিক

আমার এই অভিমত যে আমেদাবাদের মজুর ইউনিয়ন সারা ভারতের জন্য আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উহার ভিত্তি হইতেছে অহিংসা, বিশুদ্ধ অবিমিশ্র অহিংসা। উহার কর্মকালে কোনও বিপর্যয় এ পর্যন্ত হয় নাই। উহা শক্তি হইতে অধিকতর শক্তির পথে বিনা আড়ম্বরে অগ্রসর হইয়াছে। এই সংস্থার হাসপাতাল আছে, মজুরদের, বালকবালিকাদের বিদ্যালয় আছে, বয়স্কদিগকে পড়াইবার ক্লাশ আছে, নিজস্ব ছাপাখানা ও খাদিভাণ্ডার আছে এবং নিজেদের বাসের বাড়ী আছে। সমস্ত শ্রমিকদেরই ভোট আছে এবং নির্বাচন কি হইবে তাহার নিয়ন্তা তাহারাই। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চেষ্টায় তাহারা ভোটার তালিকাভুক্ত হয়। এই সংস্থা কংগ্রেসের দলগত রাজনীতিতে কখনও অংশ গ্রহণ করে নাই। সহরের মিউনিসিপ্যাল নীতি ইহারা প্রভাবিত করে। ইহাদের দ্বারা খুব সার্থকতার সহিত ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ অহিংসমূলক ছিল। মিল মালিক ও মজুরগণের সম্পর্ক বহুল পরিমাণে স্বেচ্ছামূলক মধ্যস্থতার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। যদি আমার দ্বারা সম্ভব হইত, তবে আমি ভারতের সমস্ত শ্রমিক সংস্থা আমেদাবাদের আদর্শে পরিচালিত করিতাম। ইহা কখনো অখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিতর মাথা গুঁজিবার চেষ্টা করে নাই এবং ঐ কংগ্রেস

দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। আশা করি একদিন আসিবে যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষে আমেদাবাদের আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হইবে এবং আমেদাবাদের সংস্থা অখিল ভারত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে, কিন্তু আমি সেজন্য ব্যগ্র নহি। যখন সময় আসিবে তখনই সেইদিন আসিবে।৮

## ১৬। আদিবাসী

"রাণীপরজ" শব্দটির মত "আদিবাসী" শব্দটিও নূতন সৃষ্ট। "রাণীপরজ" মানে "কালিপরজ" অর্থাৎ কৃষ্ণকায় লোক—যদিও তাদের গায়ের রং অন্য কাহারও অপেক্ষা বেশী কালো নয়। এই শব্দটি, আমার মনে হয় ভুগতরাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আদিবাসী শব্দের মানে আদিম অধিবাসী। ভীল, গণ্ড অথবা পাহাড়ে লোক বা আদিম অধিবাসী বলিয়া বিবৃত লোকদিগকে আদিবাসী বলা হইয়াছে। "আদিবাসী" এই শব্দটি আমার বিশ্বাস ঠক্করবাপা তৈরী করিয়াছেন।

গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির ভিতর আদিবাসীদিগকে সেবা করাও একটা পদ। যদি এই পুস্তিকার বিষয় ক্রমে ইহা ষোড়শ স্থান লইয়াছে, তথাপি প্রয়োজনীয়তা হিসাবে এই কার্যক্রমে ইহার স্থান নিম্ন নহে।

আমাদের দেশটা এত বড় এবং এত বিভিন্ন প্রকারের জাতি ইহাতে বাস করে যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা খুব বেশী জানেন, তাঁহারাও এদেশের সকল লোকের কথা ও তাহাদের অবস্থার কথা জানেন না। যখন কেহ এই কথাটা নিজে নিজে উপলব্ধি করেন তখনই বুঝেন যে, আমাদের দেশকে একটা নেশন বলিয়া দাবী করাটাকে সত্য করিয়া তোলা কত কঠিন। যদি প্রত্যেকটি অংশের অপর সকলের সহিত এক বলিয়া বোধটা জীবন্ত হয়, তবেই উহা সম্ভব।

সারা ভারতে দুই কোটি আদিবাসী আছে। গুজরাটি ভীলদের ভিতরে বাপা বহু বৎসর পূর্বে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪০ সালের কাছাকাছি শ্রীযুক্ত বালাসাহেব খের থানা জেলায় এই অতি আবশ্যকীয়

সেবা কার্যে তাঁহার স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতার সহিত নিজেকে নিয়োজিত করেন, তিনিই বর্তমানে আদিবাসী-সেবা-মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে অপর কর্মীরাও আছেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় খুবই কম। সত্য বলিতে কি "ফসল ত পাওয়া যায় খুব, কিন্তু মজুরের সংখ্যাই কম"। এই সমস্ত সেবাকার্য যে কেবল জনহিতকর নয় পরন্তু নিরেট রাষ্ট্রীয় কাজ এবং এই সকল কাজই যে আমাদিগকে সত্যকার স্বাধীনতার দিকে আগাইয়া আনে, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

১৭।

কুষ্ঠরোগী কথাটার মধ্যেই একটা গ্লানি আছে। কেবল মধ্য আফ্রিকা ব্যতীত ভারতবর্ষেই সবচেয়ে বেশী কুষ্ঠরোগীর বাস।

কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম, তাঁহারা সমাজের যতটা অংশ ইহারাও ততটাই। কিন্তু যাঁহারা বড় তাঁহারাই আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করেন—যদিও এই মনোযোগের আবশ্যকতা তাঁহাদের সবচাইতে কম। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা যদিও খুব রহিয়াছে, তবুও তাহারাই ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার বস্তু হইয়া আছে। আমি এই ব্যবহারকে হৃদয়হীন বলিতে প্ররোচিত হই এবং অহিংসার দৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই হৃদয়হীনতা। মিশনারীদের সম্পর্কে তাঁহাদের প্রশংসায় এ কথা বলা যায় যে, তাহারাই ইহাদের জন্য চিন্তা ও যত্ন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে যে একটি মাত্র অনুষ্ঠান আছে, তাহা ওয়ার্দ্ধার নিকটে অবস্থিত ও শ্রীযুক্ত মনোহর দিওয়ান কর্তৃক পরিচালিত। ইহা শ্রীযুক্ত ভিনোবা ভাবের অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশাধীনে চলিতেছে। যদি ভারত আজ নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত হইত, যদি আমরা সকলে অতি দ্রুত উপায়ে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য একাগ্র হইতাম, তবে ভারতবর্ষে আজ একজনও কুষ্ঠরোগী বা ভিক্ষুক অযত্নে এবং বেহিসাবে থাকিতে পারিত না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে

আমি ইচ্ছাপূর্বক কুষ্ঠরোগীদের কথা গঠনমূলক কার্যপদ্ধতির শৃঙ্খলের ভিতর ফেলিয়াছি। ইহার হেতু এই যে, যদি আমরা নিজেদের দিকে ভাল করিয়া তাকাই তবে দেখিব যে, ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীরা যে স্থান লইয়া আছে, আধুনিক সভ্য জগতে ভারতবর্ষও সেই স্থান লইয়া আছে। যদি মহাসাগরের অপর পারের আমাদের দেশীয় ভাইদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

## ১৮। ছাত্র

শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের কথা বলা বাকী আছে। আমি তাহাদের সহিত বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াছি। তাহারা আমাকে জানে এবং আমি তাহাদিগকে জানি। তাহারা আমাকে সেবা দিয়াছে। অনেক ভূতপূর্ব কলেজের ছাত্র আমার সম্মানিত সহকর্মী। আমি জানি যে ছাত্রেরাই ভবিষ্যতের আশার স্থল। অসহযোগের খুব উৎসাহের দিনে তাহাদিগকে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে আমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল কতক প্রফেসর ও ছাত্র কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়া আছেন এবং দেশের ও নিজের জন্য অনেক কিছু লাভ করিয়াছেন। সেই ডাক পুনর্বার দেওয়া হয় নাই, কেননা দেশের হাওয়া উহার অনুকূল নয়। অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়াছে যে, বর্তমান শিক্ষা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক হইলেও, দেশের যুবকদের পক্ষে উহার প্রলোভন এড়ান কঠিন। কলেজে শিক্ষা পাইলে জীবনযাপনের একটা পথ হয়। একটা মোহন বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র ঐখানেই পাওয়া যায়। জ্ঞান লাভের সাধারণ পিপাসাও কলেজের মধ্য দিয়া না গেলে মিটান যায় না। মাতৃভাষার পরিবর্তে একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য কতকগুলি মূল্যবান বৎসর নষ্ট করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করে না। উহার মধ্যে যে পাপাচরণ রহিয়াছে তাহা তাহাদের অনুভূতিতেই আসে না। তাহারা ও তাহাদের শিক্ষকেরা এই বিষয়ে মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, দেশী ভাষা আধুনিক চিন্তা

ও আধুনিক বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করাইতে সম্পূর্ণ অপারগ। কিন্তু আমার আশ্চর্য ঠেকে জাপানীরা কেমন করিয়া কাজ চালাইতেছে। কারণ তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে জাপানী ভাষার সাহায্যে দেওয়া হয় বলিয়াই জানি। ওদিকে চীনের প্রধান সেনাপতি খুব কমই ইংরাজী জানেন, উহা না জানার মতই।

কিন্তু ছাত্রেরা যাহা তাহাই হইলেও এই যুবক যুবতীদের মধ্য হইতেই জাতির ভবিষ্যত নেতাগণের উত্থান হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা সকল রকম প্রভাব দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। অহিংসা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে না। একটা চড়ের বদলে আর একটা দেওয়া অথবা একটার বদলে দুইটা ঘা দেওয়ার কথাটা তাহারা সহজে বুঝে। উহাতেই আপাততঃ ফল লাভ হইতে দেখা যায় যদিও উহা ক্ষণিকের জন্য। কাজটার ভিতর অনন্তকাল ধরিয়া পশুবলের শক্তি পরীক্ষা রহিয়া গিয়াছে—যেমনটা আমরা পশুদের মধ্যে দেখিতে পাই অথবা যেমনটা যুদ্ধে দেখিতে পাই—যে যুদ্ধ আজ সর্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। অহিংসার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানে ধৈর্যের সহিত অনুসন্ধিৎসা এবং আরো অধিক ধৈর্যের সহিত কঠিন প্রয়োগ আরম্ভ করা। ছাত্রদিগের হাতে পাওয়ার জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামি নাই এবং উহার কারণ তাহাও যে কারণে আমি কিষাণ ও শ্রমিকদের জন্য নামি নাই। আমি নিজেই তাহাদের একজন সতীর্থ। কেবল আমার বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভিন্ন। তাহাদের প্রতি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের আসার জন্য, গবেষণা কার্যে আমার সহিত যোগ দেওয়ার জন্য আমার স্থায়ী আমন্ত্রণ রহিয়া গিয়াছে। উহার সর্তগুলি এই :—

১। ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিতে যোগ দিবে না। তাহারা ছাত্র, তাহারা অনুসন্ধিৎসু, কিন্তু তাহারা রাজনীতিক নহে।

২। তাহারা রাজনৈতিক ধর্মঘটে যোগ দিবে না। তাহাদের অবশ্য প্রিয় আদর্শ বীর থাকিবে। কিন্তু তাহাদের প্রতি আনুগত্য,

তাহারা তাহাদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অনুকরণ করিয়াই দেখাইবে। যদি তাহাদের প্রেমপুত্তলির জেল হয় অথবা মৃত্যু হয় অথবা চাই কি ফাঁসী হয়, তবে তাহাদের সে জন্য ধর্মঘট করা চলিবে না। যদি তাহাদের বেদনা অসহনীয় হয় এবং সকলেই উহা সমভাবে অনুভব করে, তবে সেই সকল ঘটনায় অধ্যক্ষের সম্মতি লইয়া স্কুল বা কলেজ বন্ধ করা যাইতে পারে। যদি অধ্যক্ষেরা না শুনেন, তবে ছাত্রেরা ভব্যভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে পারে, যে পর্যন্ত না ব্যবস্থাপকেরা অনুশোচনা করেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় ডাকেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাহারা অসহযোগিদের উপর অথবা কর্তৃপক্ষের উপর জবরদস্তি করিতে পারে না। তাহাদের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে যদি তাহারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আচরণে সম্ভ্রম রক্ষা করে, তবে তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৩। তাহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিকভাবে সুতা কাটিবে। তাহাদের যন্ত্রাদি পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহার যোগ্য অবস্থায় থাকিবে। সম্ভব হইলে সুতা কাটার যন্ত্রাদি তাহারা নিজ হাতেই করিয়া লইবে। তাহাদের সুতা স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠতম গুণবিশিষ্ট হইবে। তাহারা সুতা কাটা সম্পর্কীয় সাহিত্য পাঠ করিবে ও উহার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বুঝিবে।

৪। তাহারা সর্বদা খাদি ব্যবহার করিবে এবং অনুরূপ বিদেশী দ্রব্য বা কলের দ্রব্যের বদলে কেবল গ্রামের তৈরী দ্রব্য ব্যবহার করিবে।

৫। তাহারা অপরের উপর বন্দেমাতরম বা জাতীয় পতাকা চাপাইবে না। তবে তাহারা জাতীয় পতাকা অঙ্কিত চিহ্ন নিজ দেহে ধারণ করিতে পারে। অপরকে ঐরূপ করিতে জোর করিতে পারিবে না।

৬। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকার যে অর্থ, তাহা তাহারা নিজের মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। তাহারা অস্পৃশ্যতা বা সাম্প্রদায়িকতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে না। তাহারা অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রগণ ও হরিজনগণের সহিত সত্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে।

৭। প্রতিবেশীদের ভিতর কেহ অকস্মাৎ আহত বা পীড়িত হইলে, তাহারা তাহাদের প্রাথমিক সেবা করিবে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ময়লা সাফাইএর কাজ করিবে এবং গ্রামের শিশু ও বয়স্কদিগের শিক্ষা দেওয়ার কাজ পর্যন্ত করিবে।

৮। তাহারা রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করিবে। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভাষা বর্তমান দুইপ্রকার হরফেই, হিন্দি ও উর্দূতে শিখিবে। হিন্দী বা উর্দূতে কথাবার্তায় স্বাভাবিকভাবে যোগ দিতে পারার মত শিখিবে।

৯। তাহারা নূতন যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহা তাহাদের মাতৃ-ভাষায় অনুবাদ করিবে এবং তাহারা যখন গ্রামান্তরে সাপ্তাহিক সফরে বাহির হইবে, তখন সেই জ্ঞান বিতরণ করিবে।

১০। তাহারা গোপনে কিছুই করিবে না। তাহাদের সমস্ত ব্যবহারই ন্যায়মণ্ডিত ও খোলাখুলি হইবে। তাহারা সংযমময় পবিত্র জীবন যাপন করিবে। সমস্ত ভয় বর্জন করিবে এবং তাহাদের সতীর্থদের মধ্যে যাহারা দুর্বল তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হইয়া অহিংস উপায়ে তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিবে। আর যখন লড়াইয়ের শেষ অবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা তাহাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে এবং আবশ্যক হইলে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিবে।

১১। তাহাদের সহ-ছাত্রীদের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ও বীরোচিত ব্যবহার করিবে।

আমি যে কর্মপদ্ধতি দিলাম, ইহা অনুসরণ করিতে হইলে ছাত্রদিগকে এজন্য সময় দিতে হইবে। আমি জানি, তাহারা অনেকটা সময় আলস্যে কাটায়। খুব হিসাব করিয়া চলিলে তাহারা অনেক ঘণ্টা করিয়া সময় বাঁচাইতে পারে। কিন্তু কোনও ছাত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে তাহা আমি চাই না। আমি সেইজন্য দেশপ্রেমিক ছাত্রদিগকে এই উপদেশ দিব, তাহারা যেন একটা বৎসর এই জন্য ব্যয় করে—একবারে একসঙ্গে নয় তবে সমস্ত শিক্ষাকালের ভিতরে উহা

চালাইয়া লয়। তাহারা দেখিবে যে, ঐ এক বৎসর এইদিকে যে তাহারা দিয়াছে সে সময়টা তাহাদের বৃথা যায় নাই। এই প্রচেষ্টায় তাহাদের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক সম্পদ বাড়িবে এবং তাহাদের শিক্ষাকালেও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বৃহৎ দান তাহাদের দ্বারা হইয়া যাইবে।

## আইন অমান্যের স্থান

এই পুস্তিকায় আমি বলিয়াছি যে, যদি দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা গঠনমূলক কার্যে পাওয়া যায়, তবে অহিংস পথে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আইন অমান্য করিতেই হইবে এমনটি নাও হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার সৌভাগ্য ব্যক্তি বা জাতির অদৃষ্টে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য দেশজোড়া অহিংস প্রচেষ্টার ভিতর আইন অমান্যের স্থান কোথায়, তাহা জানা দরকার।

আইন অমান্য তিনটি কর্ম অভিমুখী হইতে পারে।

১। ইহা কোনও স্থানীয় অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সার্থকতার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। কোনও বিশেষ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কোনও বিশেষ অন্যায় বা দোষ স্খালনের জন্য আত্মবলি দ্বারা স্থানীয় জাগ্রতি সৃষ্টি করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। চম্পারণে আমি যে আইন অমান্য করি, তাহাতে এই প্রকার কি ফল হইবে তাহা দেখি নাই এবং ইহা ভালভাবে বুঝিয়াই করিয়াছিলাম যে হয়ত লোকেরাও এ বিষয় আগ্রহহীন থাকিবে। ইহার পরিণাম যে অন্যপ্রকার হইয়াছিল, তাহার হেতু, রুচি অনুযায়ী বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরের কৃপায় অথবা অদৃষ্ট ভাল বলিয়া।

৩। গঠনমূলক কার্যে পূর্ণভাবে সাড়া না পাওয়া গেলেও বর্তমানে অন্যতর ব্যবস্থা হিসাবে যেভাবে আইন অমান্য আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ করা যাইতে পারে। যদিও ইহা স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টার একটা অঙ্গ, তথাপি ইহা ইচ্ছা করিয়াই এক বিশেষ প্রতিকার কল্পে—

বাক্‌স্বাধীনতা অর্জনের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে *। আইন অমান্য কখনও একটা সাধারণ সমস্যার প্রতিকার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না—যেমন ধরুন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কিসের জন্য করা হইতেছে সে জিনিষটা নির্দিষ্ট হওয়া চাই, যাহা সকলে সহজে বুঝিতে পারে এবং যাহা প্রতিপক্ষের স্বীকার করিয়া লওয়া তাহার শক্তির মধ্যে পড়ে। যদি এই পদ্ধতি ঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে শেষ লক্ষ্যে ইহাদ্বারা অবশ্যই পহুঁছা যাইবে।

আইন অমান্যের পূর্ণ প্রয়োগ ও উহার ক্ষমতা আমি এস্থলে বিচার করি নাই। আমি ইহার ততকুটু অংশ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি, যাহাতে পাঠক গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি ও আইন অমান্যের ভিতর যে সম্পর্ক আছে তাহা ধরিতে পারেন। প্রথমোক্ত দুইটী ক্ষেত্রে কোনও ব্যাপক গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন নাই। কিন্তু আইন অমান্যই যখন স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অস্ত্ররূপে পরিকল্পিত হয়, তখন যাহারা ঐ যুদ্ধে রত তাহাদের সাক্ষাৎভাবে ও জ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত কর্মপ্রচেষ্টা উহার পিছনে থাকা চাই। এইজন্য 'আইন অমান্য' পদ্ধতি হইতেছে একদিকে সংগ্রামে নিরত লোকদের পক্ষে কর্মের প্রেরণাস্বরূপ এবং অপরদিকে প্রতিপক্ষের—বর্তমান ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রতি যুদ্ধের আহ্বানস্বরূপ। স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীভূত আইন অমান্য করিতে হইলে, তাহাতে যদি লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া সহযোগিতা না থাকে, তবে সে আইন অমান্য কেবল বৃথা আড়ম্বর এবং একেবারেই অন্তঃসারশূন্য বস্তু, একথা পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হওয়া চাই।

## উপসংহার

এই লেখা কংগ্রেসের বা কেন্দ্রীয় আফিসের অনুরোধে লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ নহে। সেবাগ্রামে কয়েকজন সহকর্মীর সহিত

---

* যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলার জন্য ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ গান্ধীজী ১৯৪১ সালে প্রবর্তন করেন। ইহা সম্পর্কে বলা হইয়াছে।—অনুবাদক

আমি যে আলোচনা করিয়াছি, ইহা তাহারই ফল। গঠনমূলক কার্যের সহিত আইন অমান্যের যোগ কোথায় এবং কেমন করিয়াই বা গঠনমূলক কর্ম করা যায়, এই বিষয়ে তাঁহারা আমার একটা কিছু লেখার অভাব বোধ করিতেছিলেন। সেই অভাব এই পুস্তিকা দ্বারা আমি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহা বিশদ আলোচনা নহে, কিন্তু কি ভাবে কর্মপদ্ধতি প্রযুক্ত হইবে তাহার জন্য ইহাতে যথেষ্ট পথ দেখান হইয়াছে।

যে কয়টি পদ দেওয়া হইল, উহার কোনও একটিকেও স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে বলিয়া পরিহাস করার ভুল যেন পাঠকেরা না করেন। অনেক লোক ছোট বড় অনেক কিছু কাজ স্বাধীনতার বা অহিংসার সহিত যোগযুক্ত না করিয়া তাহা করিয়া থাকে। সে গুলির প্রত্যাশিত, সীমাবদ্ধ মূল্য আছে। একই লোক যদি সাদা পোষাকে নাগরিকরূপে আসে, তখন তাহার কোনও মূল্য না দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যখন সে সেনানায়ক হিসাবে আসে, তখন সে একটা মস্তলোক। তাহার হাতে লক্ষ লোকের জীবন মরণ নির্ভর করে। তেমনি এক বেচারী গরীব কাটুনীর হাতে চরখা তাহাকে এক আধ পয়সা পাওয়াইয়া দেওয়ার যন্ত্র মাত্র। কিন্তু জওহরলালের হাতে সেই চরখাই ভারতের স্বাধীনতালাভের যন্ত্র হয়। পদই বস্তুর মর্যাদা দেয়। গঠনমূলক কর্মকেও তাহার পদই অসামান্য মর্যাদা ও শক্তি দান করিয়া থাকে। আমার ত ইহাই অভিমত। হইতে পারে ইহা পাগলের কথা। যদি কংগ্রেসীদের নিকট ইহার কোনও মূল্য না থাকে, তবে আমাকে বাতিল করিয়া দিতে হইবে। কেননা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি বাদ দিয়া আমার দ্বারা আইন অমান্য করান স্থানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দিয়া একটা চামচে উঠাইবার প্রচেষ্টা করা।

পুণা ১১-১১-১৯৪৫।

সম্পূর্ণ

---